সুচিপত্র

সারসংক্ষেপ 2
দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য 3
মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব 10
নারীদের ইবাদত : স্বর্ণযুগের কিছু দৃষ্টান্ত..14
ইতিকথা 20

সারসংক্ষেপ

মহান রাব্বুল আলামীন দ্বীন শিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ করে দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা, শরীয়তের ভাষায় আশরাফুল মাখলুকাত যার উপাধি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের খেতাবে ভূষিত এ মানব সম্প্রদায়। যাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দেগী আবশ্যক করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থঃ আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ৫৬)

এই বন্দেগী পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদাত পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। (যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদাত পালন করা সম্ভব নয়।) যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ে আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের জন্য এ দুয়ের রয়েছে সমান অংশগ্রহণের শরীয়ত সম্মত সুযোগ।

তথ্যসূত্রঃ https://muslimbangla.com/article/200

দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে হযরত আদম আ. ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার রবকে চিনতে পারে, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। উন্নতি-অগ্রতি এবং উভয় জাহানের শান্তি-সফলতা ও কামিয়াবীর সোপানে আরোহণ করতে পারে । শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২২৪)

আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞজন (?) এই হাদীসে উল্লেখিত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা ব্রিটিশ সিলেবাস তথা দুনিয়াবী শিক্ষা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যা স্পষ্টই ভুল। কারণ যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজের রবকে চিনতে পারে না , যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে না, যে শিক্ষা গুনাহ থেকে বাঁচতে শিখায় না তাকে ইলম বলে না। দুনিয়াবী শিক্ষা তো দূরের কথা, দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরও কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকে, নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে না পারে, তাহলে তার শিক্ষাকেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইলম বলা হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে' (সূরা ফাতিরঃ২৮)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকৃত আলেম তথা শিক্ষিত তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে। অতএব, ইলম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে খোদা ভীতির উপর আর দ্বীনী শিক্ষার ভিত্তিও হলো খোদা ভীতির উপর। তাই হাদীসে বর্ণিত ইলম দ্বারা যে খালেস দ্বীনী শিক্ষা উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে দুনিয়াবী বিদ্যা হাসিল করা কি জায়িয নেই? এর উত্তর হলো: ফরয পরিমাণ ইলম অর্জনের পরে কেউ যদি দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে, চাই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ হাসিলের জন্য করুক বা দ্বীনের খেদমতের নিয়তে করুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং শরীয়ত মোতাবেক চলে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে যদি কেউ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে তাহলে তাতে সে সাওয়াবেরও আশা করতে পারে। কারণ হাদীসে এসেছে 'কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে' (বুখারী হা. নং ১)

কিন্তু বাস্তব কথা হলো,স্কুল-কলেজে ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সেখানে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উৎসাহিত করা হয় না; বরং সেখানে এমন অনেক মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্কুলের পরিবেশই এমন যে, কেউ চাইলেও শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে না। এমতাবস্থায় দুনিয়ার ৬০-৭০ বছরের যিন্দেগীর কল্পিত সুখ-শান্তির আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে নৈতিকতা বিবর্জিত দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে নাকি পরকালের অশেষ-অসীম যিন্দেগীর সুখ-শান্তি অর্জনের আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে ? এর ফয়সালার ভার সুবিবেচকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দু- চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবী সম্মানের আশায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষা নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।

মানুষ যাতে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে পেরে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাই নিম্নে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যে বাস্তব কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মহামানব তথা নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ অর্থাৎ তারা 'নায়েবে নবী'। কেননা নবী-রাসূলগণ শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানান, অর্থ-কড়ির নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখে, টাকা-পয়সার জন্য নয়। (মাজমাউয যাওয়েদ হা.নং ৫২৩)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার সিলেবাস যারা তৈরি করেছে তাদের ওয়ারিশ। নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ নয়, কেননা তারা শিক্ষা অর্জনই করে টাকা-পয়সা কিংবা কোনো পদ হাসিলের জন্য।

২. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে নবীগণের বাস্তব ওয়ারিশ বানানোর জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে দুনিয়া উপার্জন করা যাবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈমান-আমল সেখানে গুরুত্বহীন বিষয়।

৩. যারা দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজেদের নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার ছাত্রদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের পাখা বিছানোর কোনো হাদীস নেই।

৪. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যেহেতু ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে, তাই তাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ তারা সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ মতো চলে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসে বা দাওয়াতের কাজে জুড়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. খালেস দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ বেকার থাকে না। তাদের কারণে দেশের বেকারত্ব বাড়ে না; বরং তারা একদিকে নিজ দেশে দ্বীনের খেদমত করছেন অন্য দিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম, মুয়াযি্যন, মাদরাসার শিক্ষক হয়ে কিংবা অন্য কোন খেদমত করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকেই বেকার থাকছে। কারণ দুনিয়াবী শিক্ষাটা হলো 'কর্মমুখী শিক্ষা' অর্থাৎ এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুনিয়ার বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মের সুযোগ কম থাকায় আর কর্মের প্রার্থী বেশি হওয়ায় অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও বেকার ঘুরে

বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি বেকারত্বের কারণে কেউ অর্থ উপার্জনের অনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কেউবা ছিনতাই রাহাজানির মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিতে দ্বিধা করছে না।

৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষাকেন্দ্র কওমী মাদারেসে দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। আর এখানে সরকারের কোন অনুদান নেয়া হয় না। যার কারণে সরকার নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এখানকার সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে না।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্কুল-কলেজ সরকারী হওয়ায় বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুদান গ্রহণ করায় সরকার চাইলেই নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে। আর এতে যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কওমী মাদারেসে ফরযে আইন এবং ফরযে কেফায়া উভয় প্রকারের ইলম শিক্ষা দেয়া হয়, যার দ্বারা এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে পারে আবার সাধারণ মানুষকেও সিরাতে মুস্তাকীম এর উপর পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল-কলেজে ইলমের কিছু তো নেই-ই; বরং তাদের সিলেবাসে ঈমান বিধ্বংসী অনেক মতবাদ রয়েছে। যার একটি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা।

৮ দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গুরুজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রাণীর হকও শিক্ষা দেওয়া হয়। যার ফলে তারা প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। পত্রিকা খুললেই স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের কীর্তি (?) দেখে চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আজকাল তো তারা বিশেষভাবে শিক্ষকদের পিটাতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তাছাড়া ওখানকার ছাত্ররাই তো পথে-ঘাটে ইভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে ।

৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করে এবং কেবল তারাই সহীহভাবে পিতা-মাতার রূহে সাওয়াব রেসানী করতে পারে ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন লোকেরই এই যোগ্যতা নেই যে, সে ঐ বিদ্যা দিয়ে পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়াবে বা তাদের রূহে সাওয়াব রেসানী করবে কিংবা তাদের মৃত্যুর পরের হকগুলো আদায় করবে।

১০. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত আলেম তথা নেক সন্তানের নেক আমলের সওয়াব পেতে থাকবে। (তিরমিযী হা.নং ১৩৭৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই নিজ পিতা-মাতার জন্য গুনাহে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও তাদের বদ আমলের ভাগীদার হতে থাকে। কারণ তারা তাদেরকে

কোনো নেক আমল শিক্ষা দেয়নি এবং জীবিত অবস্থায় তাদেরকে গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেনি।

১১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ দেখায় এবং জান্নাতের রাহবারী করে। এজন্যই তারা বিভিন্ন মাদরাসা-মসজিদে, মাঠে-ময়দানে কুরআন-হাদীসের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। যেমনঃ তারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে তা দেখার জন্য মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্‌বুদ্ধ করে। অনেকে লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। তাছাড়া আরো অগণিত উদাহরণ আপনি ভাবলেই পেয়ে যাবেন।

১২. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা অর্জনের জন্য বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। (জামিউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৪৫)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো ফযিলত নেই; বরং তারা তো শিখতে বসে ক্লাস রুমেও অনেক গুনাহের কাজ করে। যেমনঃ ছেলেদের মেয়েদেরকে দেখা, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা।

১৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্ম টিকিয়ে রাখছে। কারণ ইলম শিক্ষার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যাবে। আর সাধারণ মানুষ যে যতটুকুই দ্বীন পালন করছে বা দ্বীনের চর্চা করছে তা এদের উসিলায় করছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করে এবং তাদের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশে দিন দিন খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে চলাই এর প্রমাণ বহন করে। সামান্য অর্থের লোভে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরাই তো এসব এনজিওতে কাজ করছে।

১৪. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (জামেউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৮০.)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের শেষ পরিণাম অজানা; বরং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের শেষ পরিণাম সুখকর হবে না। যারা আল্লাহর হুকুম মানবে না তাদের শেষ পরিণতি খারাব হওয়াই স্বাভাবিক।

১৫. হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক 'দুনিয়ার গোটা সৃষ্টিজগত দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীর জন্য দু'আ করে'। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এ দু'আ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর বন্ধু। কারণ তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করে। আর তারা শয়তানের শত্রু কারণ তারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যদি কোনোভাবে দ্বীন না শিখে, চাই উলামায়ে কেরামের সুহবতে এসে হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে হোক, তাহলে এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ তখন তারা না জানার কারণে বা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন না করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের পথে পরিচালিত হবে।

১৭. প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষার প্রকৃত শিক্ষার্থীরা মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে ইমাম হওয়ার (নেতৃত্ব দেয়ার) যোগ্যতা রাখে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মুসলমানদের প্রতি দিনের আমল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতীটুকু করার যোগ্যতা রাখে না।

১৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার অর্থের লোভে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এক দুই টাকার লোভেও নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে কুণ্ঠা বোধ করে না। দুর্নীতিতে বাংলাদেশের বারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা (সৈনিক)। এদের মাধ্যমে তিনি নিজ দ্বীনের হেফাজত করছেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইংরেজদের মানস সন্তান। কারণ তারা তাদের চিন্তা-চেতনাই লালন করে।

২০. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, হক্কানী আলেম-উলামা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। কারণ গোমরাহীর অন্ধকারে মানুষ তাদের মাধ্যমে সুপথ পেয়ে থাকে। (মাজমাউযযাওয়ায়িদ হা.নং ৪৮৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোনো ফযিলত নেই; বরং তাদের কারো কারো মাধ্যমে পৃথিবী গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনদার হলে সেটা ভিন্ন কথা।

২১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মানুষকে রিযিক দিচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন এবং পরাচ্ছেন। (তাহযীবে তারীখে দামেস্ক ৫/ ৪৩৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্য থেকে অনেকের ভয়ানক গুনাহের কারণে দুনিয়ার মানুষকে আযাবে এবং দুর্ভিক্ষে পড়তে হয়।

২২. খালেস দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা (কওমী মাদরাসার ছাত্ররা) ইসলামের ইউনিফর্ম পরে থাকে। যেকেউ তাদেরকে দেখলেই খাঁটি মুসলিম মনে করতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিধর্মীদের ইউনিফর্ম পরে থাকে। ফলে সে মুসলিম না কাফের বাহ্যিকভাবে তা বুঝার কোনো উপায় থাকে না।

২৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর 'হায়াত'। যত দিন তারা দ্বীন চর্চায় লিপ্ত থাকবে ততদিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বহাল রাখবেন। কিয়ামাত ঘটাবেন না। (মুসলিম হা.নং ১৪৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যত বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন, তাদের কারণে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না; বরং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা যত বাড়বে পৃথিবী ততই কিয়ামাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

২৪. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, অবসর গ্রহণ করেন না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকে তো চাকুরিই পায় না। আর পেলেও ৩০-৩৫ বছর পর অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

২৫. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে হাশরের ময়দানে প্রচন্ড রোদের মাঝে যখন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তখন তাদেরকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া হবে। (তিরমিযী হা.নং ২৩৯১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য এ ধরনের কোনো ওয়াদা বা আশ্বাস কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণিত হয়নি; বরং তারা সংশোধন না হলে, হাশরের ময়দানে তাদেরকে ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

২৬. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের লকব বা সনদ চিরস্থায়ী। বেহেশতে প্রবেশ করেও তারা এ উপাধিতে ভূষিত হবেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সনদ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। অবসর গ্রহণের পরই তাদের সনদ অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। আর মরার পর কবরে ও হাশরে এ সনদের কোনো মূল্যায়নই হবে না।

২৭. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের পিতা-মাতা বা অন্য যে কেউ যত টাকা খরচ করে তাতে সে বে-হিসাব সাওয়াব পায়। (সহীহ ইবনে হিব্বান হা.নং ৪৬২৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য টাকা খরচ করলে সাওয়াব হবে এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীসে নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিছনে টাকা ব্যয় করলে গুনাহ হয়। যেমনঃ অভিনয়, নাচ-গান, প্রাণীর ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখার ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় করা হয় তাতে গুনাহ হয়।

২৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থী যদি ইলম শিক্ষা করা অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন অবস্থায় মারা গেলে এ মর্যাদা পাবে না; বরং গুনাহের কোনো কিছু শিক্ষারত অবস্থায় মারা গেলে খারাব পরিণতির আশংকাই প্রবল।

২৯. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্য। সুতরাং পরকালে তাদের বিশেষ পাওয়ার থাকবে । (মুসনাদে আহমাদ ৩/১২৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রু সাব্যস্ত হয়ে যায়।

৩০. সর্বোপরি দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মাঝে খোদাভিরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার গুণ থাকার কারণে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত সমাজকে জাহিলিয়াতের অতল গহবর থেকে উঠিয়ে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আদর্শ, সুশীল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা অসামাজিক কার্য-কলাপ। যেমনঃ হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধর্ষণ, ইভ-টিজিং, গাড়ী ভাংচুর, মারা-মারি, কাটা-কাটি, নেশা-মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে আদর্শ সমাজও বর্বর যুগের অসভ্য সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। আজ নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষার কারণেই দেশজুড়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপরও কি আমরা সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারি!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এবং নিজ অধীনস্থদের উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন ।

তথ্যসূত্র

http://www.darsemansoor.com/books/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80/

মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব

কুরআনের আলোকে:

কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য আদেশ করা হয়েছে। মহিলারাও সেই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের আলোচনা পৃথকভাবে করা না হলেও ব্যতিক্রম কতিপয় বিধান ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ বিধান পালনের ক্ষেত্রে মহিলারাও কুরআনের আদেশসূচক সম্বোধনের মধ্যে শামিল। সুতরাং প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা যেভাবে পুরুষের উপর ফরজ, তেমনিভাবে নারীদের উপরও ফরজ। নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় কুরআনের আয়াত পেশ করা হল।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন–

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ

"আল্লাহর আয়াত ও দ্বীনের জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করো।"

(সূরাহ আহযাব, আয়াত নং ৩৪)

এ আয়াতে মহিলাদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন ও বিতরণের উপর একটি অর্থবহ ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–"এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান যে, উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া তাঁদের কর্তব্য, যাতে লোকেরা সে অনুযায়ী আমল ও জীবন পরিচালনা করতে পারে। এর দ্বারা দ্বীনের মাসায়িলের ব্যাপারে একজন নারী কিংবা পুরুষের খবর গ্রহণযোগ্য হওয়াও প্রমাণিত হয়।"

(দ্রষ্টব্য : আহকামুল কুরআন–ইবনুল আরাবী, ৩য় খণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) ইবনুল আরাবী (রহ.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য তুলে ধরে লিখেছেন যে, "যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস শুনে, তা অন্যান্য লোকের কাছে পৌঁছে দেয়া তার কর্তব্য। এমন কি কুরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পূণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল করা হয়েছে অথবা নবীজীর নিকট থেকে তারা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকের নিকট পৌঁছানো সেই পূণ্যবতী স্ত্রীগণের অপরিহার্য কর্তব্য।"

(তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

অতএব, বুঝা গেলো–পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রচার-প্রসার এবং দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা যেভাবে পুরুষদের কর্তব্য, তেমনি নারীদেরও কর্তব্য। নারীরা তাদের মহলে এ দায়িত্ব আনজাম দিবে।

তেমনি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِکَ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ

“(হে নবী!) আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর আপনার অবিবেচ্যের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।”

(সূরাহ মুহাম্মদ, আয়াত নং ১৯)

এ আয়াতে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মহান আল্লাহর তাওহীদের ইল্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর সেই জ্ঞানের আলোকে নিজের ও মুমিন বান্দা-বান্দীর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, জ্ঞান অর্জনের স্থান আমলের পূর্বে। আর তাতে নারী পুরুষ উভয়েই শামিল। এ কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) এই আয়াতটি ‘বাবুল ইলমি কাবলাল কাউলি ওয়াল আমালি অর্থাৎ “বলা ও আমলের পূর্বে ইলম অর্জন করতে হবে” নামক অধ্যায়ে এনেছেন।

অন্যত্র তা‘আলা ইরশাদ করেন–

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ نَارًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।”

(সূরাহ তাহরীম, আয়াত নং ৬)

হযরত আলী (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

علموا أنفسكم وأهليكم الخير

“এই আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে কল্যাণের বিষয় শিক্ষা দাও।”

(মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৮২৬)

ইমাম নববী (রহ.) এই আয়াতের আলোকে লিখেছেন-

يأمر تعالى بطاعته ، وترك معصيته ، وأمر أهله بذلك ، والقيام عليهم ، وتأديبهم وتعليمهم ، لينجو من النار العظيمة

“এখানে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তাঁর আদেশ মান্য করার এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর পরিবার-পরিজনকেও এই নির্দেশ পালন করানো, এর উপর সুদৃঢ় রাখা এবং

তাদের এর শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। যাতে তারা জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পায়।”

(তাতরীজু রিয়াজিস সালিহীন, ১ম খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলুসী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন“পুরুষদের নিজের জন্য যে সকল জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, সেগুলো তার পরিবার-পরিজনকেও শিক্ষা দেয়া ফরজ। তবে কিছু সংখ্যক মুফাসসির ‘আনফুস’ শব্দে সন্তানদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, হাদীসের আলোকে সন্তানকে পিতার অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে।” অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন“ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যে বলেছে-হে পরিবার-পরিজন! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত এবং তোমাদের মিসকীন, ইয়াতীম ও প্রতিবেশীদের হক যথাযথভাবে আদায় কর। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তার সাথে জান্নাতে একত্রিত করবেন।” কোন কোন আলেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মূখীন হবে যে তার পরিবারকে অজ্ঞ রেখেছে।”

(তাফসীরে রূহুল মা‘আনী, ২৮ খ-, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

এ পর্যায়ে ইল্মের ফজীলত সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ে অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন —

قُلۡ ہَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَالَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

“আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ, তারা কি সমান হতে পারে?।”

(সূরাহ যুমার, আয়াত নং ৯)

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে–জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক সমান নয়। কেননা, ধর্মের জ্ঞান মানুষকে আলোকময় পথ দেখায়, মুক্তির পথ প্রদর্শন করে এবং কু-সংস্কার ও কুকর্ম থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে অজ্ঞতার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই। বরং অজ্ঞতা হল পুরোপুরি অন্ধকার। যার কারণে জেনে-বুঝে পুরোপুরি দ্বীনের উপর চলা তার জন্য কঠিন হয়। এ কারণে এ আয়াতে জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক সমান নয় বলে প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে–

اِنَّمَا یَخۡشَی اللّٰہَ مِنۡ عِبَادِہِ الۡعُلَمٰٓؤُا

“আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমরাই।” (সূরাহ ফাতির, আয়াত নং ২৮)

এ আয়াতে ধর্মীয় জ্ঞানের ফজীলত স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইলমে দ্বীন মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি করে। ফলে সে আল্লাহর আজাব ও শাস্তির ভয়ে যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে যার কাছে ধর্মীয় জ্ঞান নেই, সে আল্লাহকে চিনবে না এবং সে ন্যায়-পরায়ণতা

সম্পর্কেও অবগত হতে পারবে না। ফলে তার পক্ষে তাকওয়া অর্জন করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ নয়।

উক্ত হুকুম পুরুষ-মহিলা সবার জন্য। তাই মহিলারাও ইলম অর্জন করে আল্লাহভীতি হাসিল করতে পারে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা করেন–

يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইল্ম দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।" (সূরাহ মুজাদালা, আয়াত নং ১১)

এই আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যদি মহিলারা ইলমে দ্বীনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে, তাহলে তারা এই ফজীলত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। সুতরাং তাদের পক্ষেও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কষ্ট-সাধনা করতে হবে।

অন্য স্থান আল্লাহ তা'আলা করেন–

فَلَوۡلَا نَفَرَ مِنۡ كُلِّ فِرۡقَةٍ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوۡا فِى الدِّيۡنِ

"কেন তাদের প্রত্যেকটি দলের একেকটি অংশ বের হলো না, যেন তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে?" (সূরাহ তাওবা, আয়াত নং ১২২)

আল্লামা আলুসী (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, অনেক তাফসীর বিশারদগণের মতে এখানে "বের হওয়া" থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হওয়া উদ্দেশ্য।"

(তাফসীরে রূহুল মা'আনী)

এই আয়াতে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যদি মহিলাদের জন্য সন্নিকটে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের উপায়-উপকরণ না থাকে, তাহলে তারাও শরীয়া দিকনির্দেশনা মুতাবিক শর্তসাপেক্ষে সফর করতে পারবে।

এসব আয়াতে যদিও মহিলাদের বিষয়টা ভিন্নভাবে আলোচনায় আনা হয়নি, কিন্তু সঠিক মত অনুসারে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের এসব নির্দেশসমূহ পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানে স্বতন্ত্রভাবে মহিলাদের বিষয়টা উল্লেখ না করা এমনই, যেভাবে নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত-এর ব্যাপারে তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তারা সেই হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

তথ্যসূত্র - https://adarshanari.com/article/poth-patheo/3472/

নারীদের ইবাদত : স্বর্ণযুগের কিছু দৃষ্টান্ত

আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে জীবনের মূল লক্ষ্য—উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি মানুষ ও জীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।—সূরা যারিয়াত ৫১ : ৫৬

এ কথাটাই এক হাদীসে কুদসীতে কিছুটা বিস্তারিত এসেছে, হে আমার বান্দারা, আমি তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করিনি যে তোমরা আমার একাকিত্বের সঙ্গী হবে। এজন্যও নয় যে, জনবল কম আছে; তাই তোমাদের জনবল বাড়াব। একা হওয়ার কারণে কোনো কাজ করতে অপারগ হয়ে তোমাদের সাহায্য কামনা করছি বিষয়টি এমনও নয়। তোমাদের দ্বারা আমার কোনো উপকার হবে কিংবা কোনো ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করব, এজন্যও তোমাদের সৃষ্টি করিনি। বরং আমি তো এজন্য তোমদের সৃষ্টি করেছি যে, তোমরা সারাটা জীবন আমার বন্দেগী করবে। বেশি বেশি আমার যিকির করবে। সকাল—সন্ধ্যা আমার গুণগান গাইবে।—(ড. ইউসুফ কারযাভী রচিত ইবাদতের প্রকৃত অর্থ, পৃষ্ঠা ৪৩)

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির প্রত্যেক সদস্য থেকে তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন। কোরআনুল কারীমে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন,

﴿اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۶۰﴾ وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱

হে আদম সন্তানেরা, আমি কি তোমাদের থেকে এই ওয়াদা নিইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না। কারণ শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তোমরা আমারই ইবাদত করো। এটা সহজ—সরল পথ।—সূরা ইয়াসিন ৩৬ : ৬০—৬১

কিন্তু মানুষ কালের আবর্তনে সেই ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছে। এক আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে অনেক খোদার পূজা শুরু করে দিয়েছে। প্রত্যেক বড় বস্তুকে খোদার মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। মানুষের এ ধরনের উদাসীনতার জন্যই আল্লাহ তাআলা নবী, রাসূল এবং আসমানী কিতাব অবতীর্ণের ধারা চালু করেছেন। যার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে এক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে মাখলুকের ইবাদত থেকে বের করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

প্রত্যেক নবী ও রাসূলের নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি একই আহ্বান ছিল, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। কোরআনের বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য হাদীসে ইবাদতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে, যে নিজ জীবনের লক্ষ্য অর্জনে (ইবাদতে) সফলকাম হবে সে মহান রবের সন্তুষ্টি লাভ করবে। যে এতে ব্যর্থ হবে সে প্রভুর অসন্তুষ্টির কারণে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। এজন্য বান্দার প্রকৃত কামিয়াবী আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নত অনুযায়ী ইবাদত করার মাঝেই নিহিত। আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে অন্য পথে যে সফলতা খুঁজে বেড়াবে তার জন্য ব্যর্থতাই চূড়ান্ত পরিণতি হবে।

আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমে পুরুষের ইবাদতের আলোচনার পাশাপাশি নারীদের ইবাদতের কথাও উল্লেখ করেছেন। ইবাদতের সওয়াব ও প্রতিদানে সমান অংশীদার তারাও। কোরআনের এই আয়াতটি এ দিকেই ইশারা করছে,

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, খোদাভীরু পুরুষ ও খোদাভীরু নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও অধিক যিকিরকারী নারী, আল্লাহ এদের সকলের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।—সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইবাদত—বন্দেগীর এই নির্দেশের ওপর পুরুষ যেমন আমল করেছে নারীরাও তেমনই আমল করেছে। তারা কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না। মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের আশায় পুরুষরা যেমন আঁধার রজনিগুলো ইবাদত—বন্দেগীর বিভায় আলোকিত করেছে, তেমনই নারীরাও ইবাদত ও বন্দেগীর আলোর মাধ্যমে তাদের রজনিগুলো উজ্জ্বল করেছে। রবের সঙ্গে নির্জনে কথা বলার জন্য রাত্রিজাগরণ ও শেষ রাতের আহাজারিকে অভ্যাসে পরিণত করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আগ্রহ—উদ্দীপনা নিয়ে ইবাদতে নিমগ্ন হতেন, তেমনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংশ্রবধন্য পবিত্র স্ত্রীগণও পূর্ণ আবেগ ও আগ্রহ—উদ্দীপনা নিয়ে ইবাদতে মগ্ন হতেন। পুরুষ সাহাবীরা যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত মোতাবেক ইবাদত—বন্দেগী করতেন, তেমনই নারী সাহাবীরাও রাসূলের শিক্ষা মোতাবেক আমল করতেন।

ইবাদতের ময়দানে হযরত হাসান বসরী রহ. যেমন কামেল ওলী হয়েছেন, তেমনই রাবেয়া বসরী রহ. ও ওলী হয়েছেন। ইবাদতগুজার বান্দাদের তালিকা ওই সকল মহান নারীদের নাম উল্লেখ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, যাদের ইবাদতের আগ্রহ—উদ্দীপনা ও রবের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা—মেহনত দেখে এ যুগের নারীরাও তাদের জীবনের লক্ষ্য—উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

খাইরুল কুরুন তথা কল্যাণযুগ ও সালাফে—সালেহীনের নারীদের ইবাদতের প্রতি এতটা আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল যে, দিন—রাতের বেশিরভাগ সময় তারা মাওলার ইবাদতে কাটাতেন। নিজেদেরকে এমন—সব কাজেই ব্যস্ত রাখতেন যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হন। তারা ইবাদত—বন্দেগীতে আল্লাহর নৈকট্যের সে মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন যেখানে বর্তমান সময়ের বড় বড় ওলীদের পেঁৗছাও কঠিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন একজন ইবাদতগুজার। আল্লাহ তাআলাকে ভীষণ ভয় করতেন। চাশতের নামায গুরুত্বসহ নিয়মিত আদায় করতেন। রমযানুল মুবারকে তারাবীহর ব্যাপারে খুবই যত্নশীল ছিলেন। বেশিরভাগ সময় রোযা রাখতেন। প্রতি বছর পূর্ণ উদ্যম ও গভীর আবেগ নিয়ে হজ পালন করতেন।

গোলামদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। গোলাম কিনে কিনে আযাদ করে দিতেন।—শরহে বুলুগুল মারাম

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযি. —ও একজন ইবাদতগুজার নারী ছিলেন। রবের ইবাদতে সদা মশগুল থাকতেন। রমযান ছাড়াও তিনি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন পাবন্দীর সাথে। তাঁর সব কাজেই আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের ছাপ পরিলক্ষিত হতো। আল্লাহর আদেশ যেমন অতি গুরুত্বসহ পালন করতেন, তেমনই নিষিদ্ধ বিষয় থেকেও সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকতেন।—ইবনে সাআদ

উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. অত্যন্ত দ্বীনদার, মুত্তাকী, সত্যবাদী নারী ছিলেন। আল্লাহর দরবারে খুব কাঁদতেন। তাঁর ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতার স্বীকৃতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে গেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. আল—ইছাবা গ্রন্থে একটি ঘটনা লিখেছেন। একবার হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির কিছু সাহাবীর মাঝে গনীমতের সম্পদ বণ্টন করছিলেন। সেখানে হযরত যায়নাব রাযি. ও ছিলেন। তিনি এমন একটি কথা বললেন যা হযরত ওমর রাযি. এর অপছন্দ হলো। তখন হযরত ওমর রাযি. কিছুটা তিক্ত ভাষায় হযরত যায়নাব রাযি. কে কথা বলতে বারণ করেন। এটা দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর, তাকে কিছু বলো না। কারণ সে اوَّاه তথা আল্লাহকে খুব ভয় করে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া রাযি.—ও খুব ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইবাদত—বন্দেগীতে লিপ্ত পেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘর থেকে বাইরে যেতেন অথবা বাইরে থেকে ঘরে আসতেন তখনই তাকে রবের দরবারে মিনতি ও কান্নাকাটিতে রত পেতেন।

একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় তাঁকে নিজ ঘরের নামাযের স্থানে ইবাদতরত দেখলেন। এরপর অন্যান্য প্রয়োজন সেরে এসে দেখলেন তিনি আগের অবস্থায়ই আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তখন থেকে এভাবে ইবাদতে মশগুল আছো?

উত্তরে তিনি বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি চারটি কালিমা পাঠ করেছি। যা তিন বার পাঠ করলে তুমি এ পর্যন্ত যত তাসবীহ পাঠ করেছ তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে। সে কালিমা হলো:

سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، ورِضٰى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، ومِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

—সহীহ মুসলিম

মুসনাদে আহমাদে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাকাত নফল নামায পড়বে, জান্নাতে তার জন্য ঘর নির্মাণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ বাণী হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.ও শুনছিলেন। এরপর থেকে এই বারো রাকাতের আমল করে গেছেন। কখনো ছাড়েননি।—মুসনাদে আহমাদ : ১৯৭০৯

হযরত ফাতেমা রাযি. আল্লাহর ইবাদতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। আল্লাহর ভয়ে সদা কম্পিত থাকতেন। জবানে অবিরত আল্লাহর যিকির জারি থাকত।

হযরত আলী রাযি. বলেন, আমি ফাতেমাকে দেখতাম সে রান্না করছে, সঙ্গে আল্লাহর যিকিরও করছে। হযরত সালমান ফারসী রাযি. এর বর্ণনা, হযরত ফাতেমা রাযি. ঘরের কাজে ব্যস্ত আছেন সঙ্গে কোরআনের তেলাওয়াতও করছেন। চাক্কি পিষতে থাকা অবস্থায়ও জবানে কোরআনের তেলাওয়াত চালু থাকত।

আল্লামা ইকবালের এ পঙ্ক্তিতে হযরত ফাতেমা রাযি. এর এ স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে,

آں ادب پروردۂ صبر و رضا

آسیا گردان ولب قرآں سرا

হযরত আলী রাযি. বলেন, ফাতিমা খুব বেশি পরিমাণে আল্লাহর ইবাদত করতেন। তবুও ঘর—সংসারের কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটতে দিতেন না।

হযরত হাসান রাযি. বলেন, আমার আম্মা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরের ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থানে আল্লাহ পাকের দরবারে রোনাজারি, মিনতি, বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর প্রশংসা ও দুআ—মুনাজাতে মশগুল দেখতাম। দুআ শুধু নিজের জন্য করতেন না; বরং মুসলিম উম্মাহর নর—নারী সকলের জন্য দুআ করতেন। ইবাদতের সময় তার উজ্জ্বল চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেত। চক্ষুদ্বয় থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরত। এমনকি বেশিরভাগ সময় জায়নামায চোখের পানিতে ভিজে যেত।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, হযরত ফাতেমা রাযি. অধিকাংশ রাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন। অসুস্থতা ও দুর্বলতার সময়ও রবের ইবাদত ছাড়তেন না। আল্লাহর ইবাদত, তাঁর হুকুম পালন, তাঁর সন্তুষ্টির অনুসন্ধান, সুন্নতে নববীর অনুসরণ যেন তাঁদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।—সীরাতে ফাতেমা রাযি.

ইবাদত—বন্দেগীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর কন্যা হযরত আসমা এর সুখ্যাতি ছিল। বড় মাপের আবেদা, যাহেদা ছিলেন। অধিক ইবাদত করা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের নামায পড়াচ্ছিলেন। বহু নারী সাহাবীও সে নামাযে শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের মাঝে হযরত আসমা রাযি.ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ নামায কয়েক ঘণ্টা দীর্ঘায়িত হলো। হযরত আসমা রাযি. এর শরীর কিছুটা দুর্বল ছিল, তাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তবুও নামাযে একটানা দাঁড়িয়ে থাকেন। নামায শেষ হলে বেহুশ হয়ে পড়ে যান। চেহারা ও মাথায় পানি ছিটানো হলে হুশ ফিরে আসে।—সহীহ বুখারী : ১০৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচি হযরত উম্মুল ফযল রাযি. খুবই পরহেজগার ও ইবাদতগুজার ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা সবসময় রাখতেন।

হযরত খাওলা রাযি. ও আল্লাহর ইবাদতের প্রতি যথেষ্ট আসক্ত ছিলেন। সারা রাত ইবাদত ও নামাযে কাটিয়ে দিতেন। মুসনাদে আহমাদে তার আলোচনা এসেছে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি. এর সঙ্গে বসা ছিলেন। তখন হযরত খাওলা রাযি. সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই যে খাওলা। সে সারা রাত ইবাদত করে কাটায়। রাতে একটুও ঘুমায় না।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি সে রাতে একটুও ঘুমায় না? এরপর বললেন, মানুষের এ পরিমাণ আমল করা উচিত যা সে সর্বদা করতে পারে।—মুসানাদে আহমাদ: ২৫৬৩২

হযরত সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাযি. এর স্ত্রী একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, তার স্বামী তাকে নামায পড়ার ব্যাপারে কঠোরতা করেন। রোযা রাখলে রোযা ভাঙিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাযি. কে ডেকে এর কারণ জানতে চাইলেন।

হযরত সফওয়ান রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে নামাযে বড় দুটি সূরা পড়ে। তাই তাকে বারণ করেছি। রোযা ভাঙানোর প্রকৃত ঘটনা হলো, সে নফল রোযা রাখা শুরু করলে আর বন্ধ করে না। এতে আমার কষ্ট হয়।—মুসনাদে আহমাদ: ১১৮০১

হযরত আয়েশা বিনতে তালহা একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ। সকাল—সন্ধ্যা আল্লাহর যিকির দ্বারা তার জিহ্বা সজীব থাকত। তার অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই পবিত্র অন্তরাত্মা তাকে সকল নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছিল। অনেক বিষয় স্বপ্নযোগে তার জানা হয়ে যেত।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের বোন হাফসা বিনতে সিরীন স্বীয় যুগের একজন বিখ্যাত নারী তাবেঈ। তার মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন তৎকালীন বিজ্ঞ আলেমগণ। হাফসা বিনতে সিরীন আত্মিক পরিশুদ্ধি, পবিত্র ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবনবোধ, দ্বীনদারি ও ইবাদত—বন্দেগীর দিক থেকে যুগের শ্রেষ্ঠ নারী ছিলেন। ইবাদতের জন্য তার বিশেষ কামরা ছিল। তিনি সেখানে নির্জনে ইবাদতে মগ্ন হতেন। আল্লাহর নৈকট্য ও ঊর্ধ্বজাগতিক সে উন্নত মর্যাদার আসন তিনি লাভ করেছিলেন যে পর্যন্ত শুধু বড় বড় আবেদ—যাহেদগণই পৌঁছাতে পারেন।

মাহদী বিন মাইমুন রহ. বলেন, হাফসা বিনতে সিরীন ত্রিশ বছর তাঁর ইবাদতের কামরায় এমনভাবে কাটিয়েছেন যে দুপুরের অল্প বিশ্রাম ও মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত সেখান থেকে বের হননি।—সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৫০৭

হযরত মুআযাহ বিনতে আব্দুল্লাহ একজন নারী তাবেঈ। হযরত আলী রাযি. ও হযরত আয়েশা রাযি. এর শিষ্য। স্বীয় যুগের বড় মাপের আবেদা ছিলেন। নিজের নফসকে সম্বোধন করে বলতেন, হে নফস, তোমার সামনে ঘুমের দীর্ঘ সময় আসছে। তুমি চাইলে কবরে তোমার আফসোস কিংবা

আনন্দের দীর্ঘ ঘুম ঘুমাতে পারবে। এরপর তার ঘুম চলে যেত। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত, দুআ—মুনাজাত ও কান্নাকাটিতে মগ্ন হয়ে যেতেন।—সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৫০৯

হযরত মুআযাহ এর কাছে সকালের কোরআন তেলাওয়াত খুবই প্রিয় ছিল। তার হৃদয় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানে সদা মশগুল থাকত। ইবাদতকে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। এমনকি বাসর রাতটিও তার ইবাদতে কেটে যায়। সারা রাত যিকির—আযকার করতে থাকেন। এভাবেই ফজরের আযান শুনতে পেতেন।

তার নিয়মিত আমল ছিল, প্রতিদিন ছয়শ রাকাত নামায। প্রতি রাতে কোরআন তেলাওয়াত। শীত শুরু হলে হযরত মুআযাহ রাতে পাতলা কাপড় পরিধান করতেন। যাতে ঘুমভাব দূর হয়ে যায় এবং ইবাদতে অলসতা না আসে।—আহমাদ খলীল জুমআহ রচিত নিসাউন মিন আসরিত তাবিঈন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আযালী রহ. বর্ণনা করেন, মক্কায় খুবই সুন্দর ও রূপসি একজন নারী ছিলেন। রূপ—সৌন্দর্য নিয়ে তার অনেক গর্ব ছিল। একবার সে উবায়েদ ইবনে উমায়ের রহ. এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিলেন। কথার ফাঁকে সে তার চেহারার কাপড় সরিয়ে তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল। তখন উবায়েদ বিন উমায়ের রহ. তাকে মৃত্যু, কবর, আল্লাহর সামনে বান্দার হাজির হওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করলেন। এতে সে এতটাই প্রভাবিত হলো যে, ঘরে গিয়ে স্বামীকে বলল, আমরা দুজনই এতদিন অন্যায়—অপরাধ ও উদাসীনতায় জীবন কাটিয়েছি। এখন থেকে জীবন নতুন করে সাজাব। এরপর থেকে সে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতে মনোযোগী হয়। তার স্বামী বলত, উবায়েদ বিন উমায়ের আমার স্ত্রীকে কী এমন সবক দিল যে, সে সদা আল্লাহর ইবাদতে পড়ে থাকে এবং দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপন করতে শুরু করেছে।—তাম্বীহুল গাফেলীন

এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে, নারীরা ইবাদতে কখনো পুরুষদের থেকে পিছিয়ে ছিল না। বরং নারীদের ইবাদতের আগ্রহ এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক এবং আল্লাহর প্রতি মহব্বত পোষণে তাঁরা অনন্য। বর্তমান যুগের নারীরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুনিয়া—আখেরাতে চির সফল হতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ
https://muslimbangla.com/article/42/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A4-:-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4

ইতিকথা

ইলমে-দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। যাতে করে তারা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন করে ইহকালের কল্যাণ ও পরকালের নাজাত হাসিল করা যায়।একমাত্র সহীহ দ্বীন শিক্ষার দ্বারাই হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় এর পার্থক্য নির্ণয় করত: সকল প্রকার ভ্রান্তি পরিহার করে ঈমান ও আমলের পথে জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা যায়। এ জন্যই কুরআন ও হাদীসে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব ও তাগিদ দিয়ে অসংখ্য বাণী বিদ্যমান।

জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা একজন পুরুষের জন্য যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, একজন নারীর জন্যও ঠিক ততটুকুই অপরিহার্য। যাতে করে মুসলমানদের প্রতিটি ঘর হয় এক একটি দ্বীন শিক্ষার বিদ্যাপীঠ। প্রতিটি মায়ের কোল হয় শিশুর দ্বীন শিক্ষার সুতিকাগার। আর মাতৃকূল থেকেই শিশুরা সুশিক্ষায় হাতে খড়ি পেয়ে তিলে তিলে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় এবং মানবীয় গুণের বিকাশের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

Assignment prepared by

Farhana Jesmin

Batch-202

Roll no.- 20202177

Islamic Online Madrasah

Address- Holding no:195, Shaktala, Sadar Dakkhin, Cumilla

Phone- 01714857231